প্রলয়-তারার ধ্বংসলীলা

এইচ জি ওয়েলস

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

প্রলয়-তারার ধ্বংসলীলা

(The Star)

['The Star' প্রথম প্রকাশিত হয় 'The Graphic' পত্রিকায় ডিসেম্বর ১৮৯৭ সালে। 'Doubleday & McClure Co.' থেকে ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত 'Tales of Space and Time' সংকলনটিতে গল্পটি স্থান পায়। জুন ১৯২৬ সালে গল্পটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। 'Amazing Stories' পত্রিকায়।]

সূর্যকে প্রদক্ষিণরত গ্রহদের মধ্যে দূরতম গ্রহ নেপচুন যে হঠাৎ টলমল করে উঠেছে, এ খবর প্রথম প্রচারিত হল নতুন বছরের পয়লা তারিখেই। সব কটা মানমন্দির থেকেই প্রায় একই সঙ্গে জানানো হল, নেপচুনের গতিপথ আগের মতো আর নেই রীতিমতো টলটলায়মান! গতিবেগ যে কমে এসেছে, এরকম একটা সন্দেহের আভাস ডিসেম্বরেই দিয়েছিলেন ওগিলভি। বেশির ভাগ মানুষই খবরটা নিয়ে মাথা ঘামায়নি–কেন-না নেপচুন গ্রহের অস্তিত্বের খবরই তারা রাখত না। অত দূরে ধূলিকণার মতো একটা আলোকবিন্দুর সহসা আবির্ভাবে নেপচুন গ্রহ চঞ্চল হয়েছে কেন, তা উত্তেজিত করেনি জ্যোতির্বিজ্ঞানী যারা নয়, তাদের কাউকেই। চঞ্চল হয়েছিলেন কিন্তু বিজ্ঞানীরা। ছোট্ট আলোককণাটা দ্রুত বড় হচ্ছে, উজ্জ্বলতর হচ্ছে, অন্য গ্রহদের নিয়মমাফিক গতিপথের ধারকাছ দিয়েও যাচ্ছে না–সবই তাঁরা লক্ষ করেছিলেন। উপগ্রহ সমেত নেপচুনের কক্ষপথচ্যুতি এভাবে এর আগে কখনও ঘটেনি।

বিজ্ঞানে যাদের অনুশীলন নেই, সৌরজগতের বিশাল বিচ্ছিন্নতা তাদের কল্পনায় আসবে না। সৌরজগতের বাইরের মহাশূন্যতাও ধারণা করতে পারবে না। নেপচুনের পর যে ধু ধু শূন্যতা, তা দশ লক্ষ মাইলকে দুকোটি দিয়ে গুণ করলে যা দাঁড়ায়–তা-ই। এখানে আলো নেই, তাপ নেই, শব্দ নেই। নিকষ শূন্যতা ছাড়া কিছু নেই। নিকটতম তারামণ্ডল রয়েছে। এরপরেই। মাঝেমধ্যে ক্ষীণতম অগ্নিশিখার মতো দু-একটা ধূমকেতু দেখা যায় এই বিপুল মহাশূন্যতার মধ্যে–এ ছাড়া এখানকার আর কোনও খবর রাখে না মানুষ। রহস্যময় এই কালো অঞ্চল থেকেই সহসা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আবির্ভূত হল এই আগন্তুক টহলদার। বিশাল বস্তুপুঞ্জ। কৃষ্ণরহস্য থেকে বেরিয়ে এসেই ধেয়ে চলল জ্বলন্ত সূর্যের দিকে। দ্বিতীয় দিনেই দূরপাল্লার যন্ত্রে দেখা গেল তাকে রেগুলাসের কাছে লিও তারামণ্ডলের পাশে। বিশাল ব্যাস। অল্পক্ষণের মধ্যেই মামুলি দূরবিনেও ধরা পড়ল তার চেহারা।

তৃতীয় দিনে পৃথিবীর সব মানুষকে সজাগ করে দিলে খবরের কাগজগুলো। মহাশূন্যের এই প্রেতচ্ছায়াকে আর উপেক্ষা করা যায় না। লন্ডনের একটা দৈনিক লিখল, খুব সম্ভব

নেপচুন গ্রহকে ধাক্কা মারতে চলেছে মহাকাশের আগন্তুক। তেসরা জানুয়ারি সূর্যাস্ত হতেই পৃথিবীর মানুষরা আকাশপানে চেয়ে রইল আসন্ন সংঘাতের আশঙ্কায় শিহরিত অন্তরে।

লন্ডনের রাস্তাঘাট থেকে দেখা গেল একটা বিশাল সাদা তারা–দেখা গেল সমুদ্র থেকেও। আচমকা পশ্চিম আকাশে উঠে এসেছে নবাগত নক্ষত্র!

সন্ধ্যাতারার চাইতেও উজ্জ্বল নক্ষত্র। মিটমিটে আলোককণা নয়–পরিষ্কার চাকাঁপানা দেহ। সারারাত ধরে বড় হচ্ছে আকার। ভোরের দিকে হল আরও স্পষ্ট। বিজ্ঞান যার বৃত্তান্ত জানে না, সাধারণ মানুষ তার এই চেহারা দেখে আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেল। না জানি আবার কী মহামারী আর মহাযুদ্ধ নিয়ে এল এই উৎপাত। বুয়র, হটেনটট, নিগ্রো, ফরাসি, স্প্যানিয়ার্ড, পর্তুগিজ প্রত্যেকেই ভোরের আলোয় স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল অদ্ভুত নতুন নক্ষত্রের দিকে।

সংঘর্ষটা লাগল তারপরেই। বহু দুরের দুটি জ্যোতিষ্ক কাছাকাছি হয়েই মিশে গেল। একসঙ্গে। রুদ্রতেজের ঝলক সূচনা করল নেপচুন গ্রহের মৃত্যু। আগন্তুক গ্রহের ধাক্কায় দুই জ্যোতিষ্ক তালগোল পাকিয়ে আরও বিরাট নক্ষত্রের আকারে ঢলে পড়ল পশ্চিমের আকাশে পূর্বে সূর্য ওঠার আগেই। দূর সমুদ্রের নাবিকরা দেখল, আচমকা আকাশে উঠে এল এক নয়া চাঁদ–স্থির হয়ে ভেসে রইল মাথার ওপররাত ফুরালেই ঢলে পড়ল পশ্চিমে। ক্যামেরা আর স্পেকট্রোস্কোপে ধরে রাখা হল সেই দৃশ্য।

ইউরোপের আকাশে নবাগতকে দেখেই আঁতকে উঠল আপামর মানুষ। আকারে আরও বড়–গতকালের চাইতেও। সাদা আগুনের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ছে সামনে। পশ্চিমের চাঁদও সে তুলনায় নিষ্প্রভ। প্রতিটি ছাদ আর পাহাড় থেকে দেখা গেল তাকে।

মানমন্দিরের বৈজ্ঞানিকরা দেখল আরও ভয়ংকর ঘটনা। বিচিত্র নতুন তারা শুধু

আকারেই বড় হয়নি–আরও কাছে এগিয়ে আসছে! টেলিগ্রাম মারফত বিদ্যুৎ বেগে খবর ছড়িয়ে গেল তামাম দুনিয়ায়। রহস্যময় আগন্তুক এগিয়ে এসেছে পৃথিবীর অনেক কাছে। মাঠে-ঘাটে-হাটেও দেখা গেল, সত্যিই অনেক কাছে চলে এসেছে নবাগত হানাদার!

সন্ধে নামল। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দেখা গেল আকাশের আতঙ্ককে–যেন একটা হলদে প্রেত–চাঁদের মতো সাদা ঝকঝকে নয়। সূর্য ডুবেছে, অথচ আকাশ আলোয় আলো হয়ে রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় এক বড়লোক রাস্তায় আলোর মালা ঝুলিয়েছিল বিয়ে উপলক্ষে। আকাশের আলো দেখে হতবাক হল সে। খুশিও বটে। আকাশেও আলো ঢেলে দিয়ে গেল নতুন তারা।

গণিত-গুরু কাগজপত্র সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তাঁর নিজস্ব ঘরে। চার রাত ওষুধ খেয়ে জেগে থেকেছেন–শুধু অঙ্ক কষে গেছেন। হিসেবে তাঁর ভুল হয়নি। সাদা শিশির মধ্যে এখনও একটু ওষুধ পড়ে রয়েছে–কিন্তু আর রাত জাগার দরকার হবে কি? হিসেব ঠিকই আছে। পৃথিবীর শেষ দিন। ঘনিয়ে এল বলে।

উঠে দাঁড়ালেন গণিত-গুরু। জানলার সামনে গিয়ে খড়খড়ি তুলে চেয়ে রইলেন চিমনি আর বাড়ির ছাদের ওপর ঝুলন্ত তারার দিকে।

চেয়ে রইলেন নির্নিমেষে। অকুতোভয় সৈনিক যেন নিরীক্ষণ করছেন বিষম বৈরীকে। চোখের পাতা ফেললেন না বেশ কিছুক্ষণ। তারপর নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করে বললেন নিজের মনে, হত্যা তুমি করতে পার আমাকে–কিন্তু তোমাকে আর এই গোটা ব্রহ্মাণ্ডটাকে এই মাথার মধ্যে ধরে রাখার ক্ষমতা আমার আছে। ছোট্ট এই মস্তিষ্কে বন্দি রইলে তুমি।

পরের দিন কাঁটায় কাঁটায় ঠিক দুপুরবেলা ঢুকলেন ক্লাসঘরে। তুলে নিলেন একটা চকখড়ি। এটা তাঁর মুদ্রাদোষ। চকখড়ি নিয়ে নাড়াচাড়া না করলে বক্তৃতা দিতে পারেন না। ছাত্রছাত্রীরা একবার সে এক্সপেরিমেন্ট করে খুব মজা পেয়েছে। আজ কিন্তু তাঁর

মুখচ্ছবি দেখে থমথম করতে লাগল গোটা ক্লাস। চকখড়ি নাড়তে নাড়তে বললেন গণিত-গুরু, যা পড়াব ঠিক করেছিলাম, তা আর শেষ করতে পারব না। কারণ, মানুষ জাতটা বৃথাই এসেছিল পৃথিবীতে সংক্ষেপে, এই আমার আজকের বক্তৃতা।

বিমূঢ় ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপারটা প্রাঞ্জল করে দিয়েছিলেন অচিরেই ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্ক কষে।

সেই রাতেই আরও বৃহৎ, আরও স্পষ্ট, আরও ঝকঝকে হয়ে উঠল নতুন তারা। একটু দেরিতেই আবির্ভূত হল আকাশে। দ্যুতিময় নীলচে হয়ে উঠল কালো আকাশ। আলোর দাপটে একে একে অদৃশ্য হয়ে গেল লিও প্রমুখ অনেক নক্ষত্র–বৃহস্পতিকেই কেবল দেখা গেল মাথার ওপর। নবাগতের চারধারে জ্যোতির্বলয়ের মতো নিষ্প্রভ আলোকচ্ছটা। নিরক্ষীয় অঞ্চলের পরিষ্কার আকাশে তার আয়তন চাঁদের আয়তনের চার ভাগের এক ভাগ। ইংল্যান্ডের মাটি ছুঁয়ে রয়েছে কুয়াশা তখনও–কিন্তু গোটা পৃথিবী উদ্ভাসিত হল অত্যুজ্জ্বল চাঁদের আলোয়। শীতল পরিষ্কার আলোয় স্পষ্ট পড়া গেল ছাপা হরফ। হলদে ম্যাড়মেড়ে হয়ে উঠল শহরের বাতিগুলো।

জেগে রইল তামাম দুনিয়ার মানুষ। গির্জায় গির্জায় বাজল ঘণ্টা, দেবালয়ে উপাসনালয়ে শুরু হল প্রার্থনা–অনেক পাপ করেছ পৃথিবীর মানুষ, আজ রাতে আর ঘুমিয়ো না, আর পাপ করো না। এসো, বন্দনা কর নতুন তারাকে। নতুন তারা তখন মুহূর্তে মুহূর্তে আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে–ভীমবেগে ধেয়ে আসছে যেন পৃথিবীর দিকেই।

তাই ঘুম এল না কারও চোখে। ভিড় করে দাঁড়িয়ে রইল ছাদে, রাস্তায়, জাহাজের ডেকে। এক-এক সেকেন্ডে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড পেরিয়ে আসছে কয়েকশো মাইল। গণিত গুরুর ভবিষ্যদ্বাণী আর কারও অজানা নেই। আগন্তুকের লক্ষ্য সূর্য। নেপচুনকে কোলে

নিয়ে মহাবেগে সোজা ছুটছে সূর্যের দিকে। পৃথিবীর কয়েক লক্ষ মাইল দূর দিয়ে বেরিয়ে যেত, যদি না বৃহস্পতির টলটলায়মান অবস্থা না দেখা যেত। সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতি। তার পাশ দিয়েই আসতে হবে আগন্তুককে। প্রচণ্ড আকর্ষণের ফলে কক্ষ্যচ্যুতি ঘটবে বৃহস্পতির–উপবৃত্তের আকার নেবে কক্ষপথ। নতুন তারাও সোজা পথ থেকে একটু বেঁকে গিয়ে ছুটবে সূর্যের দিকে যাওয়ার পথে হয় আছড়ে পড়বে পৃথিবীর ওপর, নয়তো এত গা ঘেঁষে যাবে যে, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, জলপ্লাবন, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, সাইক্লোন মিলেমিশে মহাপ্রলয় ডেকে আনবে পৃথিবীর বুকে।

গণিত-গুরুর এহেন ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়ে তুলতে যাচ্ছে মাথার ওপর ওই শীতল জ্বলন্ত একক তারকা।

সারারাত চেয়ে থেকে যারা চোখ টনটনিয়ে ফেলল, তারা কিন্তু স্পষ্ট দেখল, শনৈঃ শনৈঃ এগচ্ছে দুরন্ত তারকা। আবহাওয়াও পালটে গেল সেই রাতেই। মধ্য ইউরোপ, ফ্রান্স আর ইংল্যান্ডের বরফ নরম হয়ে এল বাতাস গরম হয়ে ওঠায়।

গণিত-গুরুর কথা কিন্তু সবাই মেনে নিতে পারেনি। পৃথিবীর সব মানুষ ভয়ে কাঠ হয়ে থাকেনি। প্রতি দশজনের মধ্যে একজন উৎকণ্ঠিত থেকেছে–বাকি নজন স্বাভাবিক জীবনযাপন করে গেছে–আকাশের উৎপাত নিয়ে মাথা ঘামায়নি। এক হাজার সালেও নাকি এমনি উদ্ভট ভবিষ্যদ্বাণী শোনা গিয়েছিল। তারপরেও অনেকে এমনি বুক-কাঁপানো শেষের সেদিনের বার্তা শুনিয়েছে। কিন্তু কিছুই হয়নি। এখনও কিছু হবে না। যে আসছে, সে নক্ষত্র নয়–নিছক ধূমকেতু, গ্যাসের পিণ্ড। নক্ষত্রও যদি হত, পৃথিবীকে ধাক্কা মারতে তার বয়ে গেছে। সুতরাং আজগুবি তত্ত্বকথা নিয়ে বেশির ভাগ মানুষই বাজে সময় নষ্ট

করতে চাইলে না। তাচ্ছিল্য করল গণিত-গুরুর সাবধানবাণীকে। ডুবে রইল যে যার কাজে। এমনকী অপরাধীমহলও আবার তৎপর হল অপরাধ অনুষ্ঠানে। দু-একটা কুকুরের ডাক ছাড়া পশুজগৎও মাথা ঘামাল না নতুন তারাকে নিয়ে।

গণিত-গুরু বলেছিল, সেই রাতেই গ্রিনউইচ সময়ের ৭টা ১৫ মিনিটে, বৃহস্পতির সবচেয়ে কাছে আসবে নতুন তারা।

সন্ধে হল। যথাসময়ে আগন্তুককে দেখা গেল ইউরোপের আকাশে। এক ঘণ্টা পরেও আকার বাড়ল না তার। শুরু হয়ে গেল হাসি আর টিটকিরি। হায়! হায়! গণিত-গুরুর এত অঙ্ক শেষে বৃথাই গেল! বিপদ তো কেটে গেছে, দেখাই যাচ্ছে।

তারপরেই মিলিয়ে গেল হাসি। আবার বাড়ছে তারার আকার। আগের চাইতেও দ্রুত। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বড় হচ্ছে ঘণ্টায় ঘন্টায়। থেমে থাকার কোনও লক্ষণই নেই। সেই সঙ্গে বাড়ছে ঔজ্জ্বল্য। মাথার ওপর খ-বিন্দুতে আসার পর যেন দিনের আলো ছড়িয়ে গেল মর্তে। বৃহস্পতির টানে বাঁকা পথে না এলে পাঁচ দিনের পথ একদিনেই ছুটে আসত। বাঁচিয়ে দিয়েছে বৃহস্পতি। কিন্তু এখন? পরের রাতেই ইংরেজরা দেখলে, চাঁদের তিন ভাগের এক ভাগ আয়তন নিয়েছে আগন্তুক তারা, বরফ গলে যাওয়া আর চোখের ভুল নয় –ঘটনা। আমেরিকার আকাশে নতুন তারা আবির্ভূত হতেই আঁতকে উঠল দেশের লোক। সর্বনাশ! এ যে চাঁদের মতোই বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু চাঁদের মতো ঠান্ডা তো নয়। গনগনে সাদা চোখ মেলে চেয়ে থাকাও যাচ্ছে না। নিদারুণ উত্তাপে গরম বাতাস ঝড়ের মতোই বইতে শুরু করেছে এর মধ্যেই। ভার্জিনিয়া, ব্রাজিল আর সেন্ট লরেন্স উপত্যকায় শুরু হয়ে গেল বজ্রবিদ্যুৎ, শিলাবৃষ্টি। মানিকতাবায়ে বরফ গলে গিয়ে

শুরু হল বন্যা। চিরতুষার গলতে শুরু করল পৃথিবীর সব কটা উঁচু পাহাড়ে। বরফ-গলা জল গাছ-পশু-মানুষ ভাসিয়ে নেমে এল সমতলভূমির দিকে নদীগুলোর দুকূল ছাপিয়ে–প্রাণ নিয়ে ছুটল সমতলের মানুষ।

আর্জেন্টিনা থেকে দক্ষিণ আটলান্টিক উপকূল বরাবর জলোচ্ছ্বস এত উঁচুতে ঠেলে উঠল, যা অতীতে কখনও দেখা যায়নি। বহু জায়গায় প্রবল ঝড় ঠেলে নিয়ে গেল জলকে ভূখণ্ডের অনেক ভেতর পর্যন্ত–ডুবিয়ে দিল শহরের পর শহর। দারুণভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেল রাত্রে। ফলে, সকালবেলার সূর্যকে মনে হল যেন নিছক একটা ছায়া। শুরু হল ভূমিকম্প। বেড়ে চলল পলকে পলকে। শেষকালে আমেরিকা থেকে আরম্ভ করে মেরুবৃত্ত হয়ে কেপ হন পর্যন্ত বিরাট অঞ্চলের প্রতিটি পাহাড়-পর্বতে ধস নামল, মাটি চৌচির হয়ে ফেটে গেল, বাড়িঘরদোর ধূলিসাৎ হল। কোটোপাক্সির পুরো পাশটা দুমড়ে-মুচড়ে যেন বিষম যন্ত্রণায় পিছলে যাওয়ার ফলে তোড়ে বেরিয়ে এল লাভাস্রোত, ঠেলে উঠল অনেক উঁচুতে এবং বিশাল অঞ্চল জুড়ে বেগে ধেয়ে গিয়ে একদিনেই পৌঁছে গেল খোলা সমুদ্রে।

নিবু নিবু অবস্থায় চাঁদ যখন উঁকি দিল আকাশে, আগন্তুক তারার দাপট তখন চলেছে গোটা প্রশান্ত সাগরীয় অঞ্চলে। পেছনে টেনে আনছে ঝড়বিদ্যুৎকে। সেই সঙ্গে উত্তাল হয়ে উঠছে জলরাশিফঁসে উঠে জলোচ্ছ্বাসের আকারে ঝাঁপিয়ে পড়ছে একটার পর একটা দ্বীপে মানুষশূন্য করে ছাড়ছে প্রতিটি দ্বীপকে। চোখধাঁধানো দ্যুতি যখন অসহ্য হয়ে উঠেছে, যখন গরমে চামড়া পুড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, যখন মনে হচ্ছে, লক্ষ চুল্লি জ্বলছে আকাশে-বাতাসে–তখন পঞ্চাশ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস গজরাতে গজরাতে নারকীয় ক্ষুধা নিয়ে আছড়ে পড়ল এশিয়ার সুদীর্ঘ উপকূলের ওপর এবং অগ্নিনিঃশ্বাসের মতো

ঝড়ের ঠেলায় ভীমবেগে ঢুকে পড়ল চীন দেশের সমতলভূমিতে। সূর্যের চাইতেও বিরাট আর জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে তখন আগন্তুক তারকা, সূর্যের চাইতেও লেলিহান এবং তপ্ত মুহূর্তের জন্য প্রলয়ংকর সেই রূপ দেখল চীনের মানুষ। দেখল প্যাগোডা, মহীরুহ, রাস্তা, চাষের মাঠ থেকে আকাশের আতঙ্ক আকাশ পুড়িয়ে ধ্বংস করে চলেছে বিশাল চীন। দেশকে–অন্য কোনও দেশে এত মানুষ নেই, যা আছে চীন দেশে। দেশসুদ্ধ মানুষের ঘুম উড়ে গেল চোখ থেকে। আকাশের বিভীষিকা ক্ষণেকের জন্যে দেখে আঁতকে উঠতেই-না উঠতেই চাপা গজরানির শব্দে রক্ত জল হয়ে গেল প্রত্যেকের–এল প্রবল জলোচ্ছ্বাস। পালিয়ে যাবে কোথায়? উত্তাপে চামড়ায় ফোঁসকা পড়ছে, তপ্ত বাতাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে নেওয়ায় ফুসফুস জ্বলে যাছে, তারপরেই ওই কালান্তক জলোচ্ছ্বাস-পঞ্চাশ ফুট উঁচু। এল অতর্কিতে, মৃত্যু ঢেলে দিয়ে গেল আচম্বিতে। নিষ্প্রাণ হয়ে গেল চীন দেশ।

গনগনে অঙ্গারের মতো সাদা হয়ে গেল চীন দেশ, কিন্তু জাপান, জাভা আর পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলোর ওপর ম্যাড়মেড়ে লাল আগুনের বলের মতো দেখা গেল বৃহৎ তারকাকে উন্মত্ত আগ্নেয়গিরিগুলোর ছাই, বাষ্প আর ধোঁয়ার আবরণের মধ্যে দিয়ে। নতুন তারাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যেই এলাহি কাণ্ড আরম্ভ করে দিয়েছিল সব কটা আগ্নেয়গিরি একযোগে। মাথার ওপর লাভা, গরম গ্যাস আর ছাই–নিচে ফুঁসছে জল, মাটি কাঁপছে ভূমিকম্পে। দেখতে দেখতে গলে গেল হিমালয় আর তিব্বতের চিরতুষার। এক কোটি ধারায় ছেয়ে নেমে এল ব্রহ্মদেশ আর হিন্দুস্থানের ওপর। হাজারখানেক জায়গায় দাউদাউ করে জ্বলতে লাগল ভারতের নিবিড় জঙ্গল। ধাবমান জলের মধ্যে দিয়েও দেখা গেল জায়গায় জায়গায় লেলিহান অগ্নিশিখা। রক্তের মতো লাল আগুন লক্ষ জিহ্বা মেলে নৃত্য করতে লাগল মহাপ্লাবনের মাঝে মাঝে। দিশেহারা মানুষ দৌড়াল নদীর তীর ছেড়ে একটাই দিকে–বাঁচবার শেষ ভরসা রয়েছে যেদিকে–সমুদ্রের দিকে।

এদিকে মুহুর্মুহু আকারে বেড়ে চলেছে প্রলয়-নক্ষত্র। আরও উত্তপ্ত, আরও উজ্জ্বল হচ্ছে। পলকে পলকে। সেই সঙ্গে এগিয়ে আসছে দ্রুত গতিবেগে। নিরক্ষীয় সমুদ্রে ধীর প্রশান্ত রোদ্দুর ঝিকমিক থাকে আবহমানকাল–কিন্তু নতুন তারা এগিয়ে আসার ফলে শান্ত জল হল অস্থির উত্তাল, বড় বড় কালো ঢেউ থেকে ফুঁসে উঠল তাল তাল বাষ্প, মাতাল ঝড়ের ঠেলায় পাক খেতে খেতে প্রেতাকারে সেই বাষ্পরাশি ধেয়ে গেল দিকে দিকে।

তারপরেই ঘটল একটা অদ্ভুত ব্যাপার। অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। ইউরোপে যারা নিষ্পলকে চেয়ে ছিল তারার উদয়ের প্রতীক্ষায়, হঠাৎ তাদের মনে হয়েছিল, পৃথিবীর বোঁ বোঁ আবর্তন বুঝি স্তব্ধ হয়ে গেল অকস্মাৎ। হাজারে হাজারে যারা পালিয়েছিল ভেঙে পড়া বাড়ি, বন্যার প্রকোপ আর ধসের ধ্বংসলীলা এড়াতে, তারাও হতবাক হয়ে গেল কাণ্ড দেখে। নতুন তারা দিগন্ত ছাড়িয়ে দেখা দিচ্ছে না! কেন? কেটে গেল ঘণ্টার পর ঘণ্টা অসহ্য উৎকণ্ঠা আর বিমূঢ়তার মধ্যে দিয়ে। তারার উদয় কিন্তু ঘটল না। চেনা নক্ষত্রমণ্ডলীগুলো দেখা গেছে পরিষ্কার আকাশে-মাটি যদিও কাঁপছে থরথর করে ঘন ঘন ভূমিকম্পে–কিন্তু গেল কোথায় মহাকাশের আগন্তুক?

নির্দিষ্ট সময়ের দশ ঘণ্টা পরে আবির্ভাব ঘটল তার–সেই সঙ্গে সূর্যর। কালান্তক তারকার সাদা গোল বুকের ঠিক মাঝখানে দেখা গেল একটা কালো চাকতি।

এশিয়ার মাথায় থাকার সময়ে আকাশের গতিপথ থেকে সরে যাচ্ছিল তারকা। ভারতের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময়ে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল তীব্র আলো। সে রাতে সিন্ধু নদের মোহানা থেকে গঙ্গা নদীর মোহানা পর্যন্ত ভারতের বিস্তৃত সমতলভূমি ডুবে গিয়েছিল অগভীর জলে–চকচকে জলে ভূতুড়ে ছায়ার মতো নিজের প্রতিবিম্ব ফুটিয়ে তুলেছিল

আকাশের আতঙ্ক। মন্দির আর প্রাসাদ, টিপি আর পাহাড় মাথা উঁচু করেছিল জল থেকে। কালো মানুষের ভিড়ে কালো হয়ে গিয়েছিল মন্দির-মসজিদ-পাহাড়-টিলার শীর্ষদেশ। মিনার-গম্বুজ-স্মৃতিসৌধেও প্রাণ বাঁচাতে জড়ো হয়েছিল ভয়ার্ত মানুষ–কিন্তু প্রাণে বাঁচেনি কেউ–প্রচণ্ড উত্তাপ আর নিঃসীম আতঙ্কে মুহ্যমান অবস্থায় তলিয়ে গিয়েছিল চকচকে কালো জলে মিনার-গম্বুজ-স্মৃতিসৌধ একে একে ধসে পড়ার পর। হাহাকারে ভরে উঠেছিল ভারতের আকাশ-বাতাস। আচম্বিতে নারকীয় চুল্লির গনগনে দ্যুতির ওপর দিয়ে ভেসে গিয়েছিল যেন একটা হিমশীতল কালো ছায়া–সীমাহীন নৈরাশ্যব্যাপী পুরো তল্লাটটার ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল হিমশীতল দমকা হাওয়া–পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ আবির্ভূত হয়েছিল মাথার ওপর। বাতাসে আগুনের হলকা কেন কমে এল, কেন হঠাৎ প্রখর দ্যুতি ঢেকে দিয়ে কালো ছায়া চকিতে ধেয়ে গেল দিগন্তব্যাপী জলরাশির ওপর দিয়ে–তা দেখার জন্যে বিভীষিকা-মুমূর্ষ মানুষগুলো ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়েছিল আকাশপানে। চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু দেখা গিয়েছিল কালো চাকতিটাকে। রাক্ষুসে তারকার ওপর আস্তে আস্তে ভেসে আসছে একটা কালো চাকতি। পৃথিবী আর তারকার মধ্যে ঢুকছে চাঁদ–মারণ-উত্তাপ বুক পেতে নিয়ে শীতল করে তুলছে পৃথিবীকে। শুরু হয়েছে নক্ষত্র-গ্রহণ! মঙ্গলময় ঈশ্বরের লীলা প্রত্যক্ষ করে সোল্লাসে দয়াময় বন্দনায় মুখর হয়েছিল দেশের মানুষ। পরক্ষণেই পূর্ব দিগন্তে টুপ করে লাফ দিয়ে উঠে এসেছিল বরুণদেব। সূর্য, চন্দ্র আর তারকা একত্রে ধেয়ে গিয়েছিল গগনপথে।

ইউরোপে যখন এ দৃশ্য দেখা গেল, তখন সূর্যের অনেক কাছে চলে এসেছে আগন্তুক তারকা। সটান সূর্যের দিকেই ছুটছে নক্ষত্র–আস্তে আস্তে কমছে গতিবেগ–তারপর থেমেও গেল একসময়ে–সূর্য আর তারকা এক হয়ে গেল। মাথার ওপর খ-বিন্দুতে এসে। চাঁদ সরে এল তারকার বুক থেকে–গ্রহণের কাজ ফুরিয়েছে–আকাশ ঝকঝকে

হয়ে ওঠায় চাঁদকে আর দেখাও যাচ্ছে না। ব্যাপারটা বোঝা গেল এতক্ষণে। পৃথিবীর খুব কাছে এসেও কাছাকাছি থাকতে পারল না রাক্ষুসে তারকা। পৃথিবীর পাশাপাশি থেকে কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করেও পৃথিবীর নাগাল ধরতে পারল না আকাশের আতঙ্ক। সূর্য তাকে টেনেছে। তাই সটান ধেয়ে যাচ্ছে সূর্যের জঠর লক্ষ্য করে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল পৃথিবীর মানুষ।

মেঘ ঘনিয়ে এল তারপরেই। মুছে গেল আকাশের দৃশ্য। বজ্রপাত আর বিদ্যুতের ঝিকিমিকি নতুন পোশাক দিয়ে মুড়ে দিল গোটা পৃথিবীকে। এমন বৃষ্টিপাত শুরু হল, যা পৃথিবীর মানুষ কখনও দেখেনি। সেই সঙ্গে খেপা আগ্নেয়গিরিগুলোও অকস্মাৎ লাভা উদগিরণ বন্ধ করে শুরু করল কাদাবমি। জল সরে গেল ডোবা জায়গা থেকে, বেরিয়ে এল কাদাজমি, সেই সঙ্গে দেখা গেল রাশি রাশি মড়া–বাচ্চা, বুড়ো, যুবক-যুবতীর। ঠিক যেন ঝড়জলে ধোয়া সমুদ্রসৈকত। মানুষ আর পশুর মৃতদেহ আটকে রইল পৃথিবীজোড়া কর্দম ভূমিতে। দিনের পর দিন কুণ্ডলী পাকিয়ে বাষ্প উড়ে গেল শুকিয়ে-আসা জমি থেকে, বিশাল খাত জেগে উঠল শুকনো কাদার বুকে। নক্ষত্রের আবির্ভাব এবং নিদারুণ উত্তাপের এই হল পরিণাম। এরই মধ্যে হপ্তার পর হপ্তা, মাসের পর মাস পৃথিবীর ঝুঁটি ধরে বারবার নাড়া দিয়ে চলল বিরামবিহীন ভূমিকম্প।

কিন্তু নক্ষত্র বিদায় নিতেই সাহস ফিরে পেয়েছিল পৃথিবীর মানুষ। একে একে ফিরে এল কাদায় বসে যাওয়া গোলাঘরে, পাঁকে ভরে যাওয়া চাষের মাঠে, ধ্বংস হয়ে যাওয়া নগরে নগরে। ঝড়জলের প্রকোপ এড়িয়ে টিকে গিয়েছিল যে কটা জাহাজ, বিমূঢ় অবস্থায় জল মেপে মেপে নতুন দিচিহ্ন ধরে ফিরে এল পরিচিত বন্দরগুলোয়। বাতাস কিন্তু গরম হয়ে রইল আগের চেয়ে, সূর্যও বড় হয়ে গিয়েছে মনে হল আগের চেয়ে–চাঁদের আয়তন কমে

এসে ঠেকেছে যেন আগের আয়তনের এক-তৃতীয়াংশে। দিনরাতের হিসেবও গেছে পালটে।

নতুন ভ্রাতৃত্ববোধের সূচনা দেখা দিল পৃথিবী জুড়ে। কালান্তক নক্ষত্র হাড়ে হাড়ে শিখিয়ে দিয়ে গেল, বিশ্বমৈত্রী একান্তই প্রয়োজন। এক ফুৎকারে অবসান ঘটতে চলেছিল মানুষ জাতটার–কী হবে অযথা রেষারেষি, দ্বন্দ্ব-কলহ নিয়ে? এসো সবাই, এক হও পৃথিবীর মানুষ। পালটে গেল আইন, বই, মেশিন আর মানুষের মনের চেহারা। পালটে গেল আইসল্যান্ড, গ্রিনল্যান্ড, বাফিন উপসাগরের উপকূলের চেহারা। শ্যামল সবুজ ভূমি দেখে চোখকেও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি অভিযাত্রী নাবিকরা। পৃথিবী আগের চেয়ে গরম হয়ে ওঠায় মানুষ জাতটা ছড়িয়ে পড়ল আরও উত্তরে আর দক্ষিণে–মেরু অঞ্চলে। বিশ্বশান্তি-মৈত্রী-সৌহারুদ এবং বিস্তৃত পতিত ভূখণ্ডে বসবাস–মহাকাশের আগন্তুক এই উপহারই দিয়ে গেল পৃথিবীকে।

মঙ্গল গ্রহের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতো নয় ঠিকই–বিপুল পার্থক্য এই দুই জগতের পণ্ডিতদের মধ্যে কিন্তু সেখানেও আগ্রহ সঞ্চারিত হল পৃথিবীব্যাপী এই প্রলয় এবং তারপরেই অভাবনীয় পরিবর্তনের সূচনা ঘটায়। একজন তো লিখেই বসল এইভাবে–মহাশূন্যের এই ভয়ংকর মিসাইলের বস্তুপিণ্ড আর উত্তাপের তুলনায় পৃথিবীর ক্ষতি খুব কমই হয়েছে বলতে হবে। সৌরজগতের মধ্যে দিয়ে সূর্যের দিকে নিক্ষিপ্ত এই জ্যোতিষ্ক পৃথিবীর কান ঘেঁষে বেরিয়ে গিয়ে রেহাই দিল সৌরপরিবারের তৃতীয় গ্রহকে। সমুদ্ররেখা তেমন কিছু পালটায়নি দেখা যাচ্ছে–শুধু যা সাদা বিরংটা (সম্ভবত জমাট জল) গুটিয়ে ছোট হয়ে গেছে দুই মেরুর চারপাশে। এই লেখা থেকেই বোঝা যায়, কয়েক মিলিয়ন মাইল দূর থেকে পৃথিবীব্যাপী বিপর্যয়কে কী চোখে দেখা হয়েছে এবং কী হলেও

হতে পারত–কিন্তু হয়নি! ম্যামথ যখন ছিল এই পৃথিবীতে, এ গল্প তখনকার গল্প। কীভাবে মানুষ প্রভাব বিস্তার করল পশুজগতের ওপর–এ গল্প সেই গল্প।